রিগার্ডিং দ্য পেইন অব আদার্স

যে-ব্যথা আনজনের

সুজান সনটাগ

boobook

অনুবাদ

সর্বজিৎ ঘোষ

সম্পাদনা

তানজিম ওহাব

নোকতা

নোকতা

বাড়ি ৬৬, সড়ক ৯এ, ফ্ল্যাট ৪বি, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
dak@noktaarts.com, noktaarts.com
+৮৮০ ১৮১৯ ২৭৬৪৫৮, +৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

প্রথম নোকতা সংস্করণ: আষাঢ় ১৪২৭, জুলাই ২০২০
প্রথম পিকাডোর সংস্করণ: বসন্ত ২০০৪

প্রচ্ছদ ও শব্দবিন্যাস
নোকতা শিল্প বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব
টেক্সট © নোকতা
বই © নোকতা

* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত শিল্পকর্মটি ক্যেথে কোলভিৎস-এর "দ্য সারভাইবর" হতে গৃহীত

ISBN 978-984-93730-5-6

পরিবেশক ▪ বুবুক
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক ▪ মনফকিরা

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সকল ইমেজের ব্যবহারের অনুমতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নেয়া সম্ভব হয়নি। যদি ব্যবহৃত কোনো ইমেজের স্বত্বাধিকারী আপত্তি উত্থাপন করেন তবে পরবর্তী মুদ্রণ বা সংস্করণে সেই ইমেজ বাদ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থটি নির্মাণ, উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক নয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এটি আমাদের ছোট প্রচেষ্টা।

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

j-batha anjoner translation of susan sontag's regarding the pain of others by sarbajit ghosh, published by nokta, july 2020, dhaka, bangladesh.

কন্টেন্ট ডেভেলোপার: মুনশি
moonsheekolkata@gmail.com

পাঠকের মূল্য
৳ ২৮৫ ▪ ₹ ২৮৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত

FSC MIX Papper FSC® C074619

... পরাজিত!
—বোদলেয়ার

অভিজ্ঞতা—ক্লেদাক্ত শিক্ষয়িত্রী এক...
—টেনিসন

boobook

সূচীপত্র ☮

অনুবাদকের কথা_৯পৃ

সম্পাদকীয়_১১পৃ

প্রথম অধ্যায়_১৭পৃ

দ্বিতীয় অধ্যায়_৩৫পৃ

তৃতীয় অধ্যায়_৬১পৃ

চতুর্থ অধ্যায়_৮৭পৃ

পঞ্চম অধ্যায়_১০৩পৃ

ষষ্ঠ অধ্যায়_১২৯পৃ

সপ্তম অধ্যায়_১৩৭পৃ

অষ্টম অধ্যায়_১৪৭পৃ

নবম অধ্যায়_১৫১পৃ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার_১৬৫পৃ

বিনীত_১৬৮পৃ

boobook

অনুবাদকের কথা

সনটাগের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এই কাজের সূত্রেই। তাঁর যুক্তিবিন্যাস, স্পষ্ট ও ধারালো গদ্য আমায় আকর্ষণ করেছে। পীড়া দিয়েছে অপেক্ষাকৃত জটিল বাক্যগঠন। চেষ্টা করেছি তাঁর গদ্যের ধাঁচটাকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখতে। ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষার শব্দের ক্ষেত্রে স্বনির্মিত কোনো পরিভাষা ব্যবহার করলে পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে মূল শব্দটি রেখে দিয়েছি প্রথমবার ব্যবহারের সময়। কোনো স্থান বা ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে শব্দটি যে ভাষার, তার উচ্চারণরীতি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করে বাংলা হরফে লেখা হয়েছে শব্দটি।

এশিয়ার যে প্রান্তে আমরা বাস করি, ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিজেরাই ঔপনিবেশিক শক্তি এবং দর্শনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন এই অঞ্চলের অনেকে। উগ্র জাতীয়তাবাদ সহজেই অপর মানুষকে কেবল একটা নাম, সংখ্যা, ধর্ম বা অঞ্চলের পরিচয়ে দাগিয়ে দেওয়া অভ্যাস করাচ্ছে। উদ্বাস্তুদের ইতিহাস ভুলে গিয়ে তাদের প্রতি অসংবেদনশীল হতে শেখাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে অপরের দুর্দশা আর সেই দুর্দশার ছবির অবিরাম প্রবাহ ঘিরে রেখেছে আমাদের। বিগত একশো বছরের দাঙ্গা, দেশভাগ, বাস্তুচ্যুতি, দুর্ভিক্ষের ইতিহাস থেকে ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে। শাসকের সুবিধামতো লেখা হচ্ছে শিশুপাঠ্য ইতিহাস। জাতীয়তাবাদী আবেগের উচ্ছ্বাসে প্রতিবেশী দেশের মানুষদের গণশত্রু বানিয়ে তোলা চলেছে উভয়ত। যুদ্ধের মর্যাদা ও বীরত্বের দাম ক্রমশ চড়ছে। ওপক্ষের প্রতি নৃশংসতার খবরে উল্লসিত হচ্ছে এপক্ষের সাধারণ মানুষ। মানুষকে যুযুধান দুই পক্ষে ভাগ করে ফেলা চলছে সর্বত্র। প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু হয়ে উঠতে

পারছে পাবজির মতো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায়। বন্ধুরা পাশাপাশি বসে দল বেঁধে শত্রুকে মারতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করছে মাথা খাটিয়ে, নাওয়া-খাওয়া ফেলে, মোবাইল কিংবা ল্যাপটপের পর্দায় তাকিয়ে। গণপিটুনিতে নিশানা করা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ অঞ্চল, ভাষা, লিঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস বা স্রেফ অচেনা যে কোনো মানুষকে। সেই পিটুনির ভিডিও করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ধর্ষণের আর খুনের ভিডিও চলে যাচ্ছে পর্নসাইটে। ধর্ষিতা নাবালিকার নাম সন্ধানতালিকার শীর্ষে রয়েছে তাতে। যে কোনো সময় যুদ্ধ লাগতে পারে—এই হাওয়ায় মেতে উঠছে দেশ, জিইয়ে রাখা হচ্ছে এই হাওয়া, আর চঞ্চল হচ্ছে সেই সকলেই, যারা ভুলে গিয়েছে পূর্ববর্তী যুদ্ধের কথা, যাদের জানানোই হয়নি কোথায় কারা কীভাবে উজাড় হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধে।

যে দুর্দশা আমার নয়, তা নজরে পড়লে কীভাবে সাড়া দেব—এ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। যুদ্ধের নৃশংসতার অবিরাম বৈদ্যুতিন প্রবাহের এই সময়ে দাঁড়িয়ে সনটাগ প্রশ্ন তুলছেন দুর্দশা, তার কারণ, উপস্থাপনার ধরন এবং প্রতিক্রিয়ার নৈতিকতা নিয়ে। বোঝার চেষ্টা করছেন অপরের দুর্দশায় প্রতিক্রিয়ার ধরন কী হয়, স্মৃতি কীভাবে কাজ করে, ছবি আর ভিডিওর কী ভূমিকা এই প্রতিক্রিয়া এবং স্মৃতির চর্চায়। দৃশ্যশিল্প এবং যুদ্ধের সম্পর্ককে নানাভাবে প্রশ্ন করছেন সনটাগ এই বইতে। বৃহৎ পুঁজি, বাজারি গণমাধ্যম এবং ক্ষমতালোভী অমানবিক অসংবেদনশীল রাজনৈতিক অভ্যাসের একচেটিয়া জমানায় এই বই অন্তত কিছু প্রশ্ন ওঠায় যদি, কারো ন্যূনতম সাহায্যেও যদি লাগে, আমাদের সামান্য পরিশ্রম আরো কিছুটা উদ্যম পাবে।

এই বইয়ের বিষয়ে নানা তর্ক, আলোচনা, প্রশ্ন করে যে বন্ধুরা আমায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের ভালোবাসা জানাই। আমার মতো আনকোরাকে ভরসা করেছেন প্রকাশক, সাহস দিয়েছেন, আমার নানা আবদার ও উৎপাতের সহর্ষ মোকাবিলা করেছেন। সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

ভুলত্রুটি যা রইল, তার দায় একান্তভাবেই আমার।

সর্বজিৎ ঘোষ, ২০১৯, অগাস্ট

সম্পাদকীয়

মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে প্রকাশিত সুজান সনটাগের শেষ বইটির মূল বিষয় কী ছিল তা নিয়ে পাঠকের মাঝে ভিন্ন মত তৈরি হয়। কারো কাছে বইটি আলোকচিত্র বোঝাপড়ার অনন্য নথি কিংবা [*অন ফটোগ্রাফি*] (১৯৭৭) বইয়ের উত্তরসুরি। অনেকের ধারণা এই বইটির মূল বিষয় হলো সভ্যতার সংকট আর যুদ্ধ, সংঘাত নিয়ে ছবির দ্বান্দ্বিক চরিত্র। আবার কারো কাছে বইটির বিষয়বস্তু পাঠক নিজেই। সেখানে লেখক সনটাগ নিজেকে আড়াল করতে চাননি। তৃতীয় এই প্রস্তাবটিই বইটিকে অনন্য চরিত্র দেয়। বইটি পড়ে কখনো মনে হয় এটা লেখকের নিজের সাথে নিবিষ্ট কথোপকথন, অনর্গল বাতচিত আর অসংখ্য প্রশ্নে জর্জরিত জবানবন্দি। সুজানের স্পষ্টভাষী অভিব্যক্তি পাঠককে ছবির সাথে নিজের একান্ত সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। আধুনিক জীবনে আলোকচিত্রের প্রবল ক্ষমতা নিয়ে লেখক সন্দিহান নন, বরং ছবির এই ক্রমশ ক্ষমতাবান হয়ে ওঠা নিয়ে লেখক শঙ্কিত। 'দর্শনেই বিশ্বাস' (seeing is believing) থেকে হয়তো আলোকচিত্রের ধারণা অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু ছবি যেন বাস্তবের সাক্ষী না হয়ে নিজেই বাস্তবতা নির্মাণ করে চলেছে। সুজান বিশেষত প্রশ্ন করেন যুদ্ধের ছবি নিয়ে, অপরের বিষাদে স্থির দৃষ্টি ঠাওর করার রীতি প্রসঙ্গে। যন্ত্রণায় কাতর কিংবা মৃত মানুষের ছবিতে প্রায়শ উপমা বসিয়ে আমরা যখন তাকে পরাবাস্তব বা সিনেমার সদৃশ বলি, সুজান প্রশ্ন করেন আমাদের অসাড় এই অনুভূতিগুলো নিয়ে।

যুদ্ধ যখন হত্যাকে ছাপিয়ে দৃশ্য হয়ে উঠে, তখন ছবি যেন ক্রমশ বাস্তবতাকে প্রতিস্থাপন করে। ছবির আকাঙ্ক্ষা যেন চেতনাখেকো আতঙ্ক, যা অবচেতনে যুদ্ধের

পুনরাবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা। নিপীড়ন যেন চিত্রকে চিরজাগরুক করে আর মগজ হয়ে ওঠে অসাড়। ছবির আলোকচিত্রী এবং দর্শক, দুজনেই এখানে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে, আর এই নিষ্ক্রিয়তা যেন অনুভূতিকে ক্রমশ ভোঁতা করে দেয়। যুদ্ধ আর নিপীড়নের এই অসংখ্য ছবি স্বীকৃত হয় 'ইতিহাসের দলিল' হিসেবে, যেন ইতিহাসের চোখের কাজ করে ক্যামেরা। কিন্তু চোখ বন্ধ করে রাখার আশঙ্কা তো থেকেই যায়, কারণ লেখকের ভাষ্যে চোখের পাতা আছে কিন্তু কানের কপাট নাই। বইয়ের একাংশ ছবির বর্ণবাদী আভাস উন্মোচন করে। আলোচিত হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ আর আফ্রিকার যুদ্ধের অসম প্রচারণা; কিংবা এম্বেডেড ফটোগ্রাফি আর সেন্সরশিপের আধিপত্য। লেখকের স্পষ্ট কথা—যুদ্ধে সর্বদাই দুটি পক্ষ থাকে। তথ্যের অনুপস্থিতিতে কালজয়ী ছবিগুলো যুদ্ধের নিরপেক্ষ কোনো ইতিহাস বয়ান করতে অক্ষম। বরং এমনও নজির আছে, তথ্য বিকৃতিতে একই ছবি হয়ে উঠেছে উভয় পক্ষের হাতিয়ার। যে দর্শক জীবনেও কখনো যুদ্ধে আক্রান্ত হয়নি কিংবা কাছ থেকে যুদ্ধ দেখেনি, তার কাছে ছবিগুলো তাৎপর্যপূর্ণ কোনো স্মৃতি নয়। লেখকের দাবি, সমবেত স্মৃতি বলতে কিছুই নেই, বরং স্মৃতি উপলব্ধিকে গ্রাস করে। বইটির সমলোচকদের একাংশ সুজানের ব্যক্তিগত জীবনের বিষাদ ও প্রতিকূলতাকে তাঁর লেখার উৎস হিসেবে খুঁজেছে। দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগে সুজানের মৃত্যু হয় বই প্রকাশের প্রায় এক বছর পর। যুদ্ধকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগও হয়েছিল সুজানের। সারায়েভো যুদ্ধ শুরুর বছরখানেক পর ১৯৯৩ সালে যুদ্ধ চলাকালীন শহরটিতে সুজান আমন্ত্রিত হয় এক চিত্র প্রদর্শনীতে। পরবর্তী দুবছরে সুজান সারায়েভোতে ফেরত আসেন আটবার, কখনো রেডিও স্টেশনের আমন্ত্রণে আর কখনো থিয়েটারে অংশ নিতে। সারায়েভোর এই অভিজ্ঞতা যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাঁর পূর্বকল্পিত সব ধারণাই ভেঙে দেয়। লেখক হিসেবে সুজান নিজের ভাবনা অবিরত পুনর্লিখনে বিশ্বাসী। এই বইটি 'অন ফটোগ্রাফি'র অনেক ভাবনাকে নতুন করে বিবেচনা করেছে, আর এই অবিরাম সংশোধনে লেখকের কোনো সংকোচ নেই। বিষাদের ছবির সাথে আমাদের আজকের সমাজকে বুঝতে এই ভাবনাগুলো সময়োপযোগী হবে। নিপীড়নের বৈশ্বিক বাস্তবতার সাথে রাষ্ট্রীয় নজরদারি আর মিডিয়া ট্রায়ালের ভাইরাল ছবিগুলো নিপীড়ন-বিরোধী নাকি সম্মতি উৎপাদনকারী সেটা বোঝা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক যুদ্ধের ছবির ধরন এবং

boiboi

গড়ন অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। হালের নাগরিক সাংবাদিকতা (citizen journalism) উন্মোচন করেছে আবু গারিবের বন্দি নির্যাতনের চিত্র, কিংবা অ্যাডাম ব্রুমবার্গ আর অলিভার চানারিনের বিমূর্ত ফটোপেপারগুলো আফগান যুদ্ধে এম্বেডেড সাংবাদিকতার প্রশ্ন উসকে দিয়েছে, যেখানে সূর্যরশ্মিতে (আলোক সংবেদনশীল) ফটোপেপার নষ্ট করে যুদ্ধের সেন্সরশিপকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে, অথবা টমাস ভ্যান হাউট্রাইভের আমেরিকায় তোলা ড্রোন চিত্রগুলি, যেগুলো মার্কিন স্পাই স্যাটেলাইটের প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বয়ং আমেরিকার সাধারণ মানুষের জীবনের উপর নজরদারি করে আর ড্রোন সারভাইলেন্সকে ছবিতে উন্মোচন করে। যুদ্ধের এই নয়া ছবিগুলো কিংবা সুজানের লেখনী যেন একই অভিজ্ঞান—নিপীড়নের ছবিতে সহানুভূতি, মানবিকতা, সমবেত স্মৃতি বা সংবেদনশীলতা যেন শুধুই মূল্যবোধের বিভ্রম, যা প্রকৃত ভয়াবহতাকে চিরন্তন আড়াল করে রাখে।

boobook boobook

তানজিম ওহাব, ২০১৯, ডিসেম্বর

১

শিরোনাম পালটে দাও,
বাচ্চাগুলোর মৃত্যু কাজে লাগানো যাবে, বারবার

১৯৩৮-এর জুন মাসে ভার্জিনিয়া উলফ প্রকাশ করেছিলেন যুদ্ধের মৌলিক কারণসমূহ প্রসঙ্গে তাঁর সাহসী, ফলত অনাহূত বিশ্লেষণ—*থ্রি গিনিস* (*Three Guineas*)। পূর্ববর্তী দুটি বছরে উলফকে তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের সঙ্গে আটক থাকতে হয়েছিল চক্রব্যূহে, আর তাঁদের চারপাশে নখদাঁত শানিয়েছিল স্পেনের ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান, তখন লন্ডনের এক বিশিষ্ট আইনজীবী চিঠি লিখে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "যুদ্ধ আটকানো যায় কীভাবে, বলতে পারেন?"—প্রাথমিকভাবে এই চিঠির এক বিলম্বিত উত্তর হিসেবেই উলফ *থ্রি গিনিস* লিখতে শুরু করেন। শুরুতেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো সত্যনিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব নাও হতে পারে। যদিও তাঁরা দুজনে একই শ্রেণিভুক্ত, যাকে বলে 'শিক্ষিত ভদ্রজন', কিন্তু একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান দুজনের মধ্যে কাজ করছে: আইনজীবীটি একজন পুরুষ এবং তিনি একজন নারী। যুদ্ধ পুরুষে বাধায়। পুরুষ (অধিকাংশ পুরুষ) যুদ্ধ পছন্দও করে, কারণ তারা মনে করে "লড়াইয়ের অবশ্যই কিছু মহিমা, প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বোপরি তৃপ্তি আছে"—যা কিনা নারীরা (অধিকাংশ নারী) অনুভব করে না, উপভোগ তো করেই না। তাঁর মতো একজন সুশিক্ষিত (পড়ুন: সুবিধাপ্রাপ্ত) এবং স্বচ্ছল নারী যুদ্ধ সম্পর্কে ঠিক কী জানবেন? তাঁর ও সেই আইনজীবীর যুদ্ধের সম্মোহনকে প্রত্যাখ্যান করবার কারণ কি আদৌ অভিন্ন হতে পারে?

যুদ্ধের কিছু ছবিকে আশ্রয় করে উলফ এই "যোগাযোগের অসুবিধা"র বিষয়টি নিরীক্ষা করতে চান। ওগুলো আসলে ছিল অবরুদ্ধ স্প্যানিশ সরকারের

ওয়ার অ্যান্ড কনফ্লিক্ট, স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার (১৯৩৬-১৯৩৯), জুলাই ১৯৩৬

যুদ্ধ আসলে এমনটাই করে থাকে। আর ওটা? হ্যাঁ, ওটাও যুদ্ধেরই ফলাফল। যুদ্ধ ছিঁড়ে নেয়, খাবলে নেয়। যুদ্ধ ফালাফালা করে দেয়, ছাল ছাড়িয়ে নেয়। যুদ্ধ ঝলসে দেয়। যুদ্ধ পঙ্গু করে, ধ্বংস করে।

এই ছবিগুলোতে আহত হওয়া নয়, ভুলতে না পারা নয়, এই বীভৎসতা, এই কশাইগিরির গোড়াটিকে নিকেশ করতে উঠেপড়ে লাগা নয়—ব্যাপারটা আসলে উলফের জন্যে ছিল এক নৈতিক দানবের গজরানি। আর আমরা যে দানব নই, আমরা শিক্ষিত শ্রেণির মানুষজন, তিনি একথাও বলছেন। তিনি বলছেন, আমাদের অভাব আসলে কল্পনার, সহমর্মিতার: আমরা এই বাস্তবকে চেতনে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছি।

কিন্তু, এটা কি মেনে নেওয়া যায় যে ছবিগুলো, সেনাবাহিনীর লড়াইয়ের বদলে নিরস্ত্র মানুষের নিধনযজ্ঞ দেখিয়েও, কেবল যুদ্ধের প্রত্যাখ্যানই আদায় করতে পারল? অন্তত রিপাবলিকের পক্ষে আরো মহতী সেনাবাহিনীর মদত তো তারা যোগাতে পারত। এটাই তো তাদের করবার কথা ছিল, নয়? উলফ এবং সেই আইনজীবীর মধ্যে হওয়া চুক্তিটি সুতরাং একেবারেই নৈর্ব্যক্তিকতা হারায়, বিশেষত ওই ভয়ানক ছবিগুলোর খাতিরে যখন একটা সাধারণ পূর্বসিদ্ধান্তের উপস্থিতি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। যদি প্রশ্নটা হতো, কীভাবে আমরা সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্প্যানিশ রিপাবলিকের সুরক্ষার জন্যে নিজেদের নিংড়ে দিতে পারি, তাহলে হয়তো ছবিগুলো সংগ্রামের ন্যায্য দাবির পক্ষে নিজেদের বিশ্বাসকে আরো জোরদার করতে পারত।

উলফ যে ছবিগুলোর অবতারণা করলেন, এগুলো কেবল যুদ্ধ—তবে একেবারে আক্ষরিক অর্থে যুদ্ধ কী করে, তা আদৌ দেখায় না। শুধু দেখা যায় যুদ্ধের একটা বিশেষ রকমফের, এমন একটা বিষয় যাকে সে সময়ে নিয়মিত 'বর্বর' বলে গাল দেওয়া হচ্ছে, এমন একটা ঘটনা যাতে সাধারণ মানুষই এর লক্ষ্যবস্তু। ১৯২০ সালে মস্কোয় একজন কমান্ডিং অফিসার হিসেবে বোমাবর্ষণ, গণহত্যা, অত্যাচার, কয়েদিদের প্রাণহানি আর অঙ্গচ্ছেদের যে কৌশল জেনারেল ফ্রাঙ্কো রপ্ত করেছিল, তা সে ব্যবহার করে। তখন, ক্ষমতাসীনদের সুবিধা অনুযায়ী, তার বলির পাঁঠা হয়েছিল স্পেনের ঔপনিবেশিক প্রজারা, যারা হতোদ্যম বা পা-চাটা নয় একেবারেই; এবার তার বলির পাঁঠা হলো খোদ দেশবাসীরাই। এই ছবিগুলোতে

করার কোনো প্রণোদনাই যোগান দেয় না—শুধু তাঁদের ছাড়া, যাঁরা সাহসিকতা আর ত্যাগের ধারণার সমস্তরকম অর্থ এবং ভরসাই হারিয়ে ফেলেছেন। সামগ্রিক ধ্বংস যুদ্ধের বদলে আত্মহত্যারই নামান্তর: সামগ্রিক ধ্বংসের চেয়ে যা মৃদু, যুদ্ধ লাগানোর বিপক্ষে যুদ্ধের সেই ধ্বংসাত্মক মহিমা স্বয়ং কোনো যুক্তি নয়, যতক্ষণ না একজন ভাবছেন যে হিংসা যেকোনো সময়েই অন্যায্য (আদতে খুব কম মানুষই এভাবে ভাবেন), ভাবছেন যে শক্তিপ্রয়োগ সর্বদা এবং সব পরিস্থিতিতেই ভুল। ভুল এই কারণে, যেমন লিখছেন সাইমোন ওয়েইল, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত যুদ্ধবিষয়ক তাঁর একটি তুখোড় প্রবন্ধ *"দ্য ইলিয়াড, অর দ্য পোয়েম অব ফোর্স"* (*The Iliad, or The Poem of Force*)-এ—হিংসা তার যেকোনো পাত্রকেই একটা জড়বস্তুতে পরিণত করে।* অতএব, যাঁরা কোনো কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সশস্ত্র আন্দোলনের কোনো বিকল্পই দেখতে পান না তাঁদের নাকচ করে দিন—হিংসা তার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কাউকেই একজন শহিদ কিংবা একজন নায়কে পরিণত করতে পারে।

[*যুদ্ধের প্রতি তীব্র প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও, ওয়েইল স্প্যানিশ রিপাবলিকের হয়ে কথা বলেছিলেন, হিটলারের জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনীতে বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তিনি স্পেনে যান; ১৯৪২-এ এবং '৪৩-এর গোড়ার দিকে, তখনই তিনি বেশ অসুস্থ এবং লন্ডনে একজন উদ্বাস্তু হিসেবে রয়েছেন, *ফ্রি ফ্রেঞ্চ* (*Free French*)-এর দপ্তরে কাজ করতেন এবং অধিকৃত ফ্রান্সে কোনো একটা মিশনে যাওয়ার আশা করতেন। (১৯৪৩-এর আগস্টে ইংল্যান্ডের একটা স্যানেটোরিয়ামে তিনি মারা যান।)]

আদতে আধুনিক জীবন, বেশ খানিকটা দূরত্ব থেকে, আলোকচিত্রের মাধ্যমে অপরের দুঃখ ছুঁয়ে নেওয়ার যে অসংখ্য সুযোগ দেয়, তার অনেকগুলো ব্যবহার রয়েছে। নির্বিচার হত্যার ছবি বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। শান্তির আহ্বান শোনাতে পারে। প্রতিশোধের চিৎকার জাগাতে পারে। কিংবা ধাঁধা-লাগা চেতনা ছবির তথ্যের সাহায্যে আবার ফিরে পেতে পারে তার বোধ, যে ভয়ানক ঘটনা সত্যিই ঘটে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের দৈনিক কাগজের প্রথম যে পাতাটা শুধু আমেরিকার নতুন যুদ্ধের খবরের জন্যেই ছিল, তার উপরের দিকের অর্ধেকটা জুড়ে কিছু ছবি বেরিয়েছিল ১৩ই নভেম্বর ২০০১ তারিখে, শিরোনাম ছিল

হয়েছিল জার্মান সেনাবাহিনী আর হাসপাতালের আর্কাইভ থেকে, যাদের মধ্যে অনেকগুলোই, যতদিন যুদ্ধ চলেছে, অপ্রকাশ্য বলে দেগে রেখেছিল সরকারি প্রহরা। খেলনা সেনা, খেলনা কামান, এবং বাচ্চা ছেলেদের আনন্দের উপকরণের ছবি দিয়ে বইটা শুরু হয়, আর শেষ হয় সামরিক কবরস্থানে তোলা কিছু ছবি দিয়ে। খেলনা এবং কবরস্থানের মাঝখানে পাঠক পেয়ে যান চার-চারটে বছরের ধ্বংস, নৃশংসতা আর ক্ষয়ক্ষতির দম বন্ধ করা একটা চিত্র-ভ্রমণ: পাতায় পাতায় ধ্বংস হওয়া, লুঠ হওয়া গির্জা আর কেল্লা, উজাড় হয়ে যাওয়া গ্রাম, উজাড় হয়ে যাওয়া বন, টর্পেডোর গুঁতো খাওয়া যাত্রীবাহী স্টিমার, ভাঙাচোরা যানবাহন, ফাঁসি দেওয়া বিবেকবান প্রতিবাদী, সামরিক রেণ্ডিখানায় আধান্যাংটো বেশ্যা, বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণে মরণযন্ত্রণা পেতে থাকা সেনানী, কঙ্কালসার আর্মেনীয় বাচ্চা। *ক্রেইগ ডেম ক্রেইগ!*-এর প্রায় সবগুলো ছবির সারিই তাকিয়ে দেখার পক্ষে বেশ কঠিন, বিশেষত মাঠে, রাস্তায় এবং অগ্রবর্তী যুদ্ধপরিখায় পুড়িয়ে দেওয়া বিভিন্ন সেনাবাহিনীর মৃত সৈনিকদের লাশের গাদার ছবিগুলো। তবে নিশ্চিতভাবেই বইটার সবচেয়ে পীড়াদায়ক পাতাগুলো হলো [*'দ্য ফেস অব ওয়ার'* (*'The Face of War'*)] নামের একটা অংশ, যার পুরোটাই সাজানো হয়েছিল আতঙ্কগ্রস্ত এবং বিমুখ করে তুলতে, যাতে রয়েছে বিশাল ক্ষতওয়ালা মুখের সৈন্যদের চব্বিশটা ক্লোজ-আপ। এবং এই গা-গোলানো, হৃদয়বিদারক ছবিগুলো নিজেদের হয়ে নিজেরাই কথা বলবে, এটা ধরে নেওয়ার মতো ভুল ফ্রেডরিখ করেননি। প্রত্যেকটা আলোকচিত্রে রয়েছে একটা করে বুক ঝিম করা ক্যাপশন, তাও আবার চার-চারটা ভাষায় (জার্মান, ফরাসি, ডাচ এবং ইংরেজি), এবং প্রতিটা পাতায় যুদ্ধবাজ আদর্শকে ব্যঙ্গ করে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত হলে তৎক্ষণাৎ একে ক্ষতিকারক বলে দেগে দেয় সরকার এবং চতুর দেশপ্রেমী সংগঠনগুলো—কোনো কোনো শহরে বইয়ের দোকানে পুলিশ হানা দেয়, ছবিগুলো সর্বসমক্ষে দেখানো হয়েছে বলে মামলা রুজু হয়—এদিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ফ্রেডরিখের এই যুদ্ধঘোষণা সাদরে প্রশংসিত হয় বামপন্থী লেখক, শিল্পী ও চিন্তকদের কাছে, প্রশংসিত হয় বেশ কিছু যুদ্ধবিরোধী সমিতির সদস্যদের কাছেও, যাঁরা আন্দাজ করেছিলেন যে এই বইটা জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। ১৯৩০-এর মধ্যে *ক্রেইগ ডেম ক্রেইগ!* জার্মানিতে দশটা সংস্করণ পেরিয়ে যায়, অনেক ভাষায় অনুবাদও করা হয়।

boiboi

১৯৩৮-এ, উলফের *থ্রি গিনিস*-এর বছরে, প্রখ্যাত ফরাসি পরিচালক আবেল গঁস ক্লোজ-আপে তাঁর নতুন ছায়াছবি জ্যাক্যুশ (*J'accuse*)-এর ক্লাইম্যাক্সে দেখিয়েছিলেন মূলত লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দেওয়া, ভয়ানকভাবে ক্ষতবিক্ষত হওয়া যুদ্ধফেরত সেনানীদের একটা অংশকে—ফরাসিতে তাদের ডাকনাম ছিল *les gueules casseés* (ভাঙাচোরা ঘটি)। (গঁস তাঁর অতুলনীয় এই যুদ্ধবিরোধী ছায়াছবির একটা পূর্বতন, পুরনো খসড়া বানিয়েছিলেন, ১৯১৮-১৯ নাগাদ, এই একই জ্বলজ্বলে শিরোনামে।) ফ্রেডরিখের বইয়ের চূড়ান্ত অংশটার মতোই, গঁস-এর ছবিও শেষ হয় একটা নবনির্মিত সামরিক গোরস্তানে—১৯১৪ থেকে ১৯১৮-র মধ্যে যুদ্ধবাজি আর অদক্ষতার হাড়িকাঠে লাখে লাখে যুবককে বলি দেওয়া হয়েছিল এমন এক যুদ্ধে, যেটি অভিনন্দিত হয়েছে “সমস্ত যুদ্ধ থামাবার জন্যে যুদ্ধ” বলে—শুধু সেইটুকু আমাদের মনে করাতেই নয়, বরং এই মৃতরা ইউরোপের রাজনীতিবিদ আর সেনানায়কদের পবিত্র বিচার নিশ্চয়ই করত, কারণ তারা জানত কুড়ি বছর পরে আরেকটা যুদ্ধ লাগতে চলেছে—আর সেই পবিত্র বিচার ত্বরান্বিত করতেও গঁসের ছবির অমন সমাপ্তি। “*Morts de Verdun, levez-vous!*” (ওরে ভার্দুর মড়াগুলো, ওঠ!), চ্যাঁচায় এক পুরনো পাগল, যে এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র, জার্মান আর ইংরেজিতে আহ্বান করে: “তোদের আত্মত্যাগ যে জলে গেল!” এই বিশাল দাফনক্ষেত্র উগরে দেয় তার অধিবাসীদের, ছেঁড়াখোঁড়া উর্দি আর ক্ষতবিক্ষত মুখের প্রেতেদের এক অষ্টাবক্র বাহিনী, যারা নিজেদের কবর ফুঁড়ে ওঠে আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আর ইউরোপজোড়া নতুন একটা যুদ্ধের জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠা জনগণের মধ্যে গণআতঙ্ক তৈরি হতে থাকে। “চোখ ভরে দ্যাখ এই আতঙ্ক! এটাই একমাত্র জিনিস যা তোদের থামাতে পারে!” পাগলটা চ্যাঁচায় পালাতে থাকা জ্যান্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে, যারা তাকে ইনাম দেয় এক শহিদের মরণ, যে মরণের পরে সে যোগ দেয় তার মৃত সহযোদ্ধাদের দলে: *লা গ্যুয়েরে ডে দেমেই* (*la guerre de demain*)-এর ভীতসন্ত্রস্ত ভাবী যোদ্ধা ও বলির পাঁঠাদের গিলে নেয় ভাবলেশহীন প্রেতদের একটা সমুদ্র। যুদ্ধ পরাস্ত হয় মহাপ্রলয়ের কাছে।

boibook

যুদ্ধ বেধেছিল ঠিক তার পরের বছরই।